প্রাচীন ন্যায়ের আলোকে প্রমাণের স্বরূপ কথন

অঞ্জন কুমার মণ্ডল

পাপিয়া গুপ্ত

সারসংক্ষেপ: যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করাই হল দর্শনের তথা ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। এই সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ভারতীয় দর্শনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হল প্রমাণ পদ্ধতি। ভারতীয় দর্শনে যতগুলি সম্প্রদায় রয়েছে তাদের মধ্যে প্রমাণের আলোচনা বিষয়ে সর্বাধিক প্রাধান্যের দাবী রাখে ন্যায়দর্শন। কেননা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা বা তর্কের পদ্ধতি তথা প্রমাণ নিরূপণ করাই হল ন্যায়দর্শনের প্রধান কাজ। ন্যায় দর্শন মোক্ষ শাস্ত্র নামেও পরিচিত। কারণ এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে পুরুষার্থ লাভের পথ নির্দেশ করা এবং ন্যায়সিদ্ধান্ত অনুসারে মোক্ষ বা অপবর্গই পরম পুরুষার্থ। অপবর্গের অর্থ জায়মান শরীরাদি সর্বদুঃখের সঙ্গে আত্যন্তিক বিমুক্তি— যা সম্ভব গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অন্য জন্মের অগ্রহণের মাধ্যমে। ন্যায়দর্শনে অপবর্গ নিঃশ্রেয়স নামেও কথিত হয় এবং নৈয়ায়িকগণ মনে করেন প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই হল নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়। কিছু সংশয়বাদী ও শূণ্যবাদী দার্শনিক মনে করেন প্রমাণ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কোনভাবেই সম্ভব হয় না, কারণ যথার্থ অনুভূতির সাধন প্রমাণ হলেও কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মালে সেই অনুভূতি যে যথার্থ হবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তার কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের মতে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় অসম্ভব। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎসায়ন এই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় অসম্ভব নয়। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণের প্রামাণ্যনিশ্চয় করা যায়।

বীজশব্দ: প্রমাণ, ন্যায়, অপবর্গ, পুরুষার্থ।

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোন বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করাই হল দর্শনের তথা ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য। এই সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য ভারতীয় দর্শনে যে পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়, তা হল প্রমাণ পদ্ধতি। ভারতীয় দর্শনে দুই প্রকার জ্ঞানের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, এক প্রকার জ্ঞানকে বলা হয় যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা। আর অন্য প্রকার জ্ঞানকে বলা হয় অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা। যে বস্তুটি যে প্রকারের নয়, সেই বস্তুটি যদি সেই প্রকার বিশিষ্ট রূপে জ্ঞান হয়, তাহলে সেই জ্ঞানকে বলা হয় অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা। অর্থাৎ অযথার্থ জ্ঞানমাত্রই তা ভ্রান্তজ্ঞান। কিন্তু কোন বিষয়ে অভ্রান্ত, সুনিশ্চিত বা নিঃসন্দিগ্ধ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই যথার্থজ্ঞান বা প্রমা নামে কথিত হয়। ভারতীয় দার্শনিকগণ মনে করেন প্রমাণই হল একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে আমরা এই যথার্থজ্ঞান বা সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি। অর্থাৎ সহজ কথায় প্রমাণলব্ধ জ্ঞানমাত্রই তা অভ্রান্ত। এই ধরনের জ্ঞান কখনোই ভ্রমাত্মক বা সংশয়াত্মক হতে পারে না।

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রমাণের আলোচনা বিষয়ে সর্বাধিক প্রাধান্যের দাবী রাখে ন্যায়দর্শন। কেননা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা বা তর্কের পদ্ধতি তথা প্রমাণ নিরূপণ করাই হল ন্যায়দর্শনের প্রধান উপজীব্য। 'ন্যায়' — এই নামকরণের মধ্যেই আমরা তার পরিচয় পাই। "নীয়তে অনেন ইতি ন্যায়" —অর্থাৎ যে প্রণালীর দ্বারা বা যে উপায়ের মাধ্যমে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাকে "ন্যায়" বলে। আর এই "ন্যায়" বা যথার্থ জ্ঞানলাভের প্রণালী সম্পর্কে যে শাস্ত্র বা দর্শন আলোচনা করে তাকে ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায় দর্শন বলে। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিনিষ্ঠ রূপটি তার স্বরূপের মধ্যেই নিহিত। ন্যায় দর্শন আন্বীক্ষি কী নামেও অভিহিত হয়, যা এর বিচার মনস্কতারই পরিচায়ক। সামান্য ব্যাখ্যা দোষবহ হবে না। শাস্ত্রের মাধ্যমে বা গুরুর কাছে

আত্মা প্রভৃতি বিষয়ে শোনার পর, যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তার মনন সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ তার পক্ষ ও বিপক্ষের যুক্তিগুলি পরীক্ষামূলক আলোচনার মাধ্যমে কতদূর গ্রহণযোগ্য সেই বিষয়টি নিরূপিত হয়। এই যে আত্মাদি বিষয়ের শ্রবণের পরে বা অপরাপর বিষয়গুলি প্রত্যক্ষের পর যুক্তির দ্বারা তার ঈক্ষা বা মনন তাকে অন্বীক্ষা বলে। অর্থাৎ ন্যায় শাস্ত্র প্রত্যক্ষ, শব্দ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে পুনরায় আলোচনা করে বলে তাকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বলে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে এ প্রসঙ্গে বলেছেন —

"তয়া প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্রম্।"[১]

ন্যায়দর্শন ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত ষড় আস্তিক দর্শনের অন্যতম যা বেদানুগত হয়েও উপনিষদের ন্যায় কেবল আত্মবিদ্যা নয়। বিচারের জন্য, বাদ-প্রতিবাদের নিমিত্ত বা যুক্তির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনের চর্চা অপরিসীম গুরুত্বের দাবী রাখে। ন্যায় দর্শন মোক্ষ শাস্ত্র নামেও পরিচিত। কারণ এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ও তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে পুরুষার্থ লাভের পথ নির্দেশ করা। অর্থাৎ জীব ও জগতের স্বরূপ আলোচনার মাধ্যমে পুরুষার্থ লাভের সঠিক সন্ধান দেওয়াই হল এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য। ন্যায়সিদ্ধান্ত অনুসারে মোক্ষ বা অপবর্গই পরম পুরুষার্থ বা পুরুষের তথা জীবের একান্ত কামনার বিষয়। অপবর্গের অর্থ জ্ঞায়মান শরীরাদি সর্বদুঃখের সঙ্গে আত্যন্তিক বিমুক্তি — যা সম্ভব গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অন্য জন্মের অগ্রহনের মাধ্যমে। আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, যা হলে পূর্বোক্ত দেহাদি ফলের ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণের সমাপ্তি হয় চিরতরে, তাই অপবর্গ। এই অপবর্গ জীবের বা আরো নির্দিষ্টভাবে বললে জীবাত্মার পুরুষার্থ। ন্যায়দর্শনে অপবর্গ নিঃশ্রেয়স নামেও কথিত হয়। "নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সম্"[২] অর্থাৎ যা নিশ্চিতরূপে শ্রেয় তাই নিঃশ্রেয়স। যেহেতু মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, তাই মুক্তি অর্থেই সাধারণতঃ "নিঃশ্রেয়স" শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে, যদিও "কল্যাণ" বা "ইষ্টমাত্র" অর্থেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন ওঠে, কিভাবে এই অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভ সম্ভব ? নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বিষয়ে ভারতীয় অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ মনে করেন প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই হল নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়। এ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম তাঁর 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থের প্রথম সূত্রে বলেছেন—

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প
-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল -জাতিনিগ্রস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"[৩]

অর্থাৎ প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই নিঃশ্রেয়স লাভ হয় । স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যায়, মহর্ষি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমাণ পদার্থকেই সকলের পূর্বে স্থান দিয়েছেন। এর কারণ স্বরূপ নৈয়ায়িকগণ বলেন, যেহেতু প্রমাণ ব্যতীত কোন কিছুই সিদ্ধ হতে পারে না, যাবতীয় পদার্থের মূলে রয়েছে প্রমাণ এবং প্রমাণই প্রমেয়াদি সকল পদার্থের ব্যবস্থাপক — তাই হয়তো মহর্ষি প্রমাণ পদার্থকে অন্যান্য সকল পদার্থের পূর্বে স্থান দিয়েছেন।

কিছু সংশয়বাদী ও শূণ্যবাদী দার্শনিক মনে করেন প্রমাণ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কোনভাবেই সম্ভব হয় না। ফলস্বরূপ প্রমাণ পদার্থের দ্বারা অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথাও আর কল্পনা করা যায় না। সংশয়বাদীরা বলেন, যথার্থ অনুভূতির সাধন-ই হল প্রমাণ। কিন্তু কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মালে সেই অনুভূতি যে যথার্থ হবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তার কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের মতে প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় অসম্ভব। সংশয়বাদীদের এই যুক্তি গ্রহণ করলে গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই যুক্তির খণ্ডন করে বলেন প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় অসম্ভব নয়। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় করা যায়। এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার তাঁর ভাষ্যের প্রারম্ভেই বলেন —

"প্রমাণতোঽর্থ- প্রতিপত্তৌ
প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্"[৪]

অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থের প্রতিপত্তি বা বোধ হলে প্রবৃত্তি সফল হয়। উক্ত বক্তব্যের দ্বারা ভাষ্যকার একথাই বোঝাতে চান যে, প্রমাণ যেহেতু সফল প্রবৃত্তির জনক, অতএব 'প্রমাণ অর্থবৎ'। ভাষ্যকারের মতে মূলত অনুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণকে অর্থবিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করা হয়। বিষয়টিকে সামান্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'অর্থবৎ' শব্দটির অর্থ হল 'অর্থের অব্যভিচারিতা'। যে পদার্থ যেরূপ ধর্মবিশিষ্ট তাকে সেরূপ ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করাই হল অব্যভিচারী। অর্থাৎ'প্রমাণ অর্থবৎ' বা 'প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী' – একথার অর্থ হল, প্রমাণ যে পদার্থকে যেরূপ ধর্মবিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন করে, সেই পদার্থ সেরূপ ধর্মবিশিষ্টই হয়, কখনো এর ব্যতিক্রম হয় না। ফলে একথা বলতে হয় যে, প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থবোধ হলে সেই বিষয়ে সফল প্রবৃত্তি জন্মায়। আর প্রমাণের দ্বারা সফল প্রবৃত্তি জন্মালে প্রমাণকে অর্থবৎ বলতে হয়। ভাষ্যকারের মতে মূলত অনুমান প্রমাণের দ্বারাই 'প্রমাণ অর্থবৎ' বা 'প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী' — একথা সিদ্ধ হয়। কাজেই 'প্রমাণের প্রামাণ্য অসম্ভব' — সংশয়বাদীদের এই যুক্তি অস্বীকৃত হয়। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 'প্রমাণং অর্থবৎ' — এই বাক্যের ভিত্তিতেই প্রমাণকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনবিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করেন। তাঁর মতেও প্রমাণ অধিক প্রয়োজন বিশিষ্ট হওয়ার কারণেই মহর্ষি সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থেরই উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র তথা ন্যায় দর্শনশাস্ত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা ও প্রমিতি বা প্রমা — এই চারটি মূলতত্ত্বের ধারণা রয়েছে। জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এই চতুর্বিধ তত্ত্ব একে অপরের পরিপূরক হলেও নৈয়ায়িকগণের মতে অপরাপর তত্ত্ব গুলির তুলনায় প্রমাণই হল সর্বজ্যেষ্ঠ, কেননা নৈয়ায়িকগণ মনে করেন প্রমাণের ভিত্তিতেই প্রমা, প্রমাতা ও প্রমেয়ের ধারণা প্রকাশিত হয়। ন্যায় দর্শনে যথার্থ অনুভবকে বলা হয় প্রমা। অর্থাৎ যে পদার্থটি যে ধর্মবিশিষ্ট, সেই পদার্থকে সেই ধর্মবিশিষ্ট রূপে জানাই হল প্রমা জ্ঞান। নৈয়ায়িকদের মতে এরূপ প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান লাভ করা হয় যে প্রণালী দ্বারা, তাই হল প্রমাণ। শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা যায়, প্রমার যা করণ, তাই হল প্রমাণ। কাজেই বলতে হয়, প্রমা জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। ন্যায়মতে যে ব্যক্তি যথার্থজ্ঞান লাভ করেন তাকে বলা হয় প্রমাতা। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের আশ্রয়রূপ জ্ঞাতাই হলেন প্রমাতা । নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যথার্থ জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতেই গুণরূপে আশ্রিত হয়, কাজেই তাঁদের মতে আত্মাই হলেন যথার্থ অর্থে প্রমাতা। এই প্রমাতা পরোক্ষ ভাবে প্রমাণের উপরেই নির্ভরশীল। কেননা, প্রমাণের দ্বারা যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলেই সেই যথার্থজ্ঞান কোন জ্ঞাতাকে আশ্রয় করে থাকে, এরফলে সেই জ্ঞাতা প্রমাতা রূপে আমাদের কাছে পরিচিত হয়। কাজেই বলতে হয় প্রমাতাও প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। আবার ন্যায় দর্শনে যথার্থজ্ঞানের যে বিষয়, তাকে বলা হয় প্রমেয়। যথার্থজ্ঞানরূপ প্রমা প্রমাণ সিদ্ধ হওয়ায়, সেই যথার্থজ্ঞানের বিষয় রূপ প্রমেয়ও যে প্রমাণ সিদ্ধ হবে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রমা, প্রমাতা ও প্রমেয় – এই তিনটি ধারনাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, কোন না কোন ভাবেই প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কাজেই বলতে হয়, ন্যায় দর্শনে অপরাপর ধারণা গুলির তুলনায় প্রমাণের স্থান সবার উপরে।

ন্যায়দর্শনে প্রমাণের স্থান আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আরো বলতে পারি, 'ন্যায়'— এই নামকরণের মধ্যেই প্রমাণের ধারণাটি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যগ্রন্থে 'ন্যায়' এর স্বরূপ দিতে গিয়ে বলেছেন— 'প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং ন্যায়ঃ'[৫]। অর্থাৎ সকল প্রকার প্রমাণের দ্বারা অর্থের পরীক্ষা হল ন্যায়। বিষয়টিকে সামান্য ব্যাখ্যা করা দরকার। উপরোক্ত শ্লোকের অন্তর্গত 'প্রমাণৈ' শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পঞ্চাবয়বী বাক্য সমূহের

প্রয়োগ করে থাকেন। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি বাক্যসমূহের দ্বারা অর্থ পরীক্ষণ হল ন্যায়। অনেকে বলতে পারেন প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বী বাক্যসমূহ যেহেতু পরার্থানুমানের অংশ, আর পরার্থানুমান যেহেতু অনুমানেরই একটি বিশেষ রূপ, অতএব শুধুমাত্র অনুমান প্রমাণের দ্বারাই অর্থের পরীক্ষণরূপ ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভাষ্যকার এরূপ মত অস্বীকার করেন। তাঁর মতে একথা ঠিক যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বী বাক্যসমূহকে প্রমাণ নামে অভিহিত করা যায় না, তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হয় যে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ— এই চতুর্বিধ প্রমাণের ভিত্তিতেই প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বী বাক্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং কেবলমাত্র অনুমান প্রমাণমূলক পঞ্চাবয়বী বাক্যের দ্বারা নয়, সকল প্রকার প্রমাণমূলক পঞ্চাবয়বী বাক্যের দ্বারা অর্থের পরীক্ষণ সম্ভব। আর এরূপ অর্থের পরীক্ষণকে বলা হয় ন্যায়। কাজেই বলতে হয়, 'ন্যায়' এর স্বরূপের মধ্যেই প্রমাণের ধারণাটি নিহিত রয়েছে।

কোন বিষয়কে বুঝে, পরে অনুমান প্রমাণ দ্বারা সেই বিষয়টিকে সেইরূপে বুঝলেও জ্ঞানটি যথার্থ হয়। মূল কথা হল, প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণসিদ্ধ কোন পদার্থ অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন হলে সেই পদার্থ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তা যথার্থই হয়। অর্থাৎ 'ন্যায়' বা 'অন্বীক্ষা'র দ্বারাই কোন ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেন, একথা বলতে হয়। ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ 'ন্যায়' বা 'অন্বীক্ষা'র দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা যায় বলে ন্যায়শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী নামে পরিচিত। সুতরাং 'আন্বীক্ষিকী'– এই নামকরণের মধ্যেও যে প্রমাণের ধারণাটি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম প্রমাণ পদার্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রথমেই ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ করেছেন। নিয়মানুসারে উদ্দেশের পরেই লক্ষণ বলা অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু মহর্ষি প্রমাণ পদার্থের উদ্দেশ নির্দেশনার পর প্রমাণ সামান্যের কোনরূপ লক্ষণ না দিয়েই তাঁর তৃতীয় সূত্রে প্রমাণের বিশেষ নিরূপণ করে বলেছেন —

"প্রত্যক্ষানুমানোপমান-শব্দাঃ প্রমাণানি।।"[৬]

অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারপ্রকার প্রমাণ স্বীকৃত। কিন্তু নিয়মানুযায়ী কোন বিষয়ের সামান্য লক্ষণ বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তার বিশেষ জ্ঞান হতে পারে না। অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রে যতক্ষন পর্যন্ত প্রমাণের সামান্য লক্ষণ না দেওয়া যায়, ততক্ষণ প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, মহর্ষি প্রমাণের সামান্য লক্ষণ না দিয়ে প্রথমেই তার বিশেষ বিভাগ নির্দেশ করেছেন কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, একথা ঠিক যে মহর্ষি স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণের কোন সামান্য লক্ষণ দেননি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি প্রমাণের সামান্য লক্ষণকে অস্বীকার করেছেন। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে অনুসরন করে প্রাচীন নৈয়ায়িক বাচস্পতি মিশ্র বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন উক্ত তৃতীয় সূত্রের অন্তর্গত 'প্রমাণ' শব্দটির শাব্দিক ব্যাখ্যার মধ্যেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ নিহিত আছে। সাধারণত সূত্রগুলি রচিত হয় খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে, যার ফলে তা সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য হয় না। আসলে কোন একটি সূত্র যে কেবল একটি বিষয়কে সূচিত করে, তা নয়। কোন কোন সূত্র বহু অর্থবোধকও হয়। উক্ত ক্ষেত্রে নৈয়ায়িক বাচস্পতি মিশ্র তাই একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, মহর্ষি তাঁর তৃতীয় সূত্রের দ্বারা একদিকে যেমন প্রমাণের বিশেষ বিভাগ নির্দেশ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি সূত্রোক্ত 'প্রমাণ' শব্দের দ্বারা প্রমাণের সামান্য লক্ষণও নির্দেশ করেছেন। আর এই কারণে মহর্ষি প্রমাণের সামান্য লক্ষণের জন্য পৃথকভাবে কোন সূত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। 'ন্যায়মঞ্জরী'কার নব্য নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও বাচস্পতি মিশ্রের এই অভিমতকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্থন করেন। তাঁর মতে —

"একেনানেন সূত্রেণ দ্বয়ঞ্চাহ মহামুনিঃ।

প্রমাণেষু চতুঃসংখ্যং তথা সামান্যলক্ষণং।।"[৭]

অর্থাৎ, একই সূত্র দ্ব্যর্থক হতে পারে, 'প্রমাণ' শব্দটির দ্বারা যেমন চতুর্বিধ প্রমাণকে বোঝায়, তেমনি তার দ্বারা প্রমাণের সামান্যলক্ষণও সূচীত হয়।

ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন 'প্রমাণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণের সামান্য লক্ষণ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'প্র'-উপসর্গ পূর্বক 'মা'-ধাতুর করণবাচ্যে 'ল্যুট' বা অনট্ প্রত্যয় যোগে 'প্রমাণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'প্র'-উপসর্গটি প্রকৃষ্ট অর্থের বোধক, আর 'মা'-ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। অর্থাৎ 'প্র-মা' কথার অর্থ হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান মূলত দু-প্রকার -অনুভব ও স্মৃতি। কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে প্র-পূর্বক মা ধাতুর অর্থ যে যথার্থ জ্ঞান, তা অনুভূতি অর্থেই প্রযুক্ত, স্মৃতি অর্থে নয়। আবার প্র-পূর্বক মা-ধাতুর সঙ্গে যুক্ত 'ল্যুট' প্রত্যয়টি এখানে করণ বা সাধন অর্থে প্রযোজ্য। অতএব ব্যুৎপত্তির দিক থেকে 'প্রমাণ' শব্দটির অর্থ এরূপ করা যায়- 'যথার্থ অনুভূতির করণত্ব'। অর্থাৎ, যথার্থ অনুভূতির করণত্ব বা প্রমা-র করণত্ব-ই হল প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। সহজকথায় বলা যায় — যার দ্বারা যে বিষয়ে যথার্থ অনুভূতি জন্মায়, তা-ই হল সে বিষয়ের প্রমাণ। অদ্বৈতবেদান্তী ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রও তাঁর বেদান্ত পরিভাষাতে প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "তত্র প্রমাকরণং প্রমাণম্"[৮]। তবে আমাদের এ বিষয়েও সচেতন থাকা দরকার যে, যথার্থ অনুভূতির কারণকে কখনোই প্রমাণ বলা যায় না। কেননা, একথা স্বীকার করলে প্রমাতা, প্রমেয় প্রভৃতিও অনুভূতির কারণ হওয়ায় এগুলিকেও প্রমাণ বলতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এগুলি প্রমাণ নয়। তাই যথার্থ অনুভূতির কারণকে প্রমাণ না বলে, যথার্থ অনুভূতির করণকেই প্রমাণ বলা হয়। আর ভাষ্যকারের মতে এটিই প্রমাণের যথার্থ সামান্য লক্ষণ।

প্রমার করণত্বরূপ প্রমাণের সামান্য লক্ষণ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথমেই আমাদের 'প্রমা' এবং 'করণ' এর স্বরূপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। প্রমাণের সামান্য লক্ষণে যেহেতু পূর্বে 'প্রমা' এবং তার পরে 'করণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই প্রথমেই প্রমার স্বরূপ আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত। তাছাড়া প্রমার জ্ঞান না হলে প্রমার করণরূপ প্রমাণের জ্ঞানও সম্ভব নয় বলে সবার আগে প্রমার স্বরূপ জানা উচিত।

ন্যায় শাস্ত্রে যথার্থ অনুভবকে বলা হয় প্রমা। অর্থাৎ অনুভবের বিষয়টি যেরূপ হয়, অনুভবটিও যদি ঠিক সেরূপ হয়, তাহলে সেই অনুভবকে বলা হবে প্রমা। অন্নংভট্ট তাঁর 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে প্রমার লক্ষণ দিয়ে বলেছেন— 'তদবতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ যথার্থঃ'[৯]। অর্থাৎ যে পদার্থ যে ধর্মবিশিষ্ট সেই পদার্থকে যদি সেই প্রকারবিশিষ্ট রূপে অনুভব হয়, তাহলে সেই অনুভবকে বলা হবে যথার্থ অনুভব। যেমন- রজতে 'ইহা রজত' -এই প্রকার জ্ঞান হল যথার্থ অনুভব। আর এই যথার্থ অনুভব-ই হল প্রমা। বিষয়টিকে আর একটু স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

অন্নংভট্ট প্রদত্ত প্রমার উক্ত লক্ষণটিতে দুটি মূল শব্দ রয়েছে— 'তদ্‌বতি' এবং 'তৎপ্রকারকঃ'। সাধারণত 'তৎ' শব্দের অর্থ করা হয় 'সেই'। কিন্তু উক্ত ক্ষেত্রে 'তৎ' শব্দের দ্বারা অনুভবের বিষয়ের প্রকার বা বিশেষণকে বোঝানো হয়েছে। যেমন — 'ঘটজ্ঞান'-এর ক্ষেত্রে ঘটের প্রকার বা বিশেষণ 'ঘটত্ব' হল 'তৎ' শব্দের অর্থ। আর 'তদ্‌বৎ' শব্দের অর্থ হল 'যে অধিকরণে সেই প্রকার বা বিশেষণটি থাকে'। 'ঘট জ্ঞান'-এর ক্ষেত্রে 'ঘটত্ব' বিশেষণটি 'ঘট' অধিকরণে থাকায় উক্ত ক্ষেত্রে 'ঘট' হল 'তদ্‌বৎ' শব্দের অর্থ। অর্থাৎ লক্ষণের অন্তর্গত 'তদ্‌বতি' পদটির অর্থ হল — 'ঘট বিশেষ্যক'। আবার 'তৎপ্রকারকঃ'— এই পদটির অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের দ্বারা 'ঘটত্ব' কে বোঝানো হয়। তাই উক্ত ক্ষেত্রে 'তৎ প্রকারকঃ' পদটির অর্থ হল — 'ঘটত্ব প্রকারক'। অতএব ঘট জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘট বিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক অনুভবই যথার্য অনুভব বা প্রমা।

নৈয়ায়িকগণ বলেন প্রমার লক্ষণের উক্ত ব্যাখ্যাটি যথাযথ নয়, এটি একটি অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। সাধারণভাবে বলা হয় 'ঘটজ্ঞান' এর ক্ষেত্রে বিষয় হল ঘট। নৈয়ায়িকগণ বলেন এরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবল ঘটকে বিষয় হিসেবে ধরা হয় না, এই জ্ঞানের বিষয় তিনটি— বিশেষ্য, বিশেষণ বা প্রকার এবং সংসর্গ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘট হল বিশেষ্য, ঘটত্ব হল বিশেষণ বা প্রকার এবং ঘটত্ব জাতি ঘটে সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলে সমবায় হল সংসর্গ। কিন্তু প্রমার লক্ষণের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় বিশেষ্য ও বিশেষণের উল্লেখ থাকলেও সংসর্গের কোন উল্লেখ নেই। এ কারণে ব্যাখ্যাটি অসম্পূর্ণ হয়েছে। তাই লক্ষণটির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার প্রতিষ্ঠাকল্পে একথা বলা যায়, ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারক সমবায়সংসর্গক অনুভবই হল যথার্থ অনুভব বা প্রমা।

অন্নংভট্ট তাঁর তর্ক দীপিকাতে তর্কসংগ্রহ প্রদত্ত প্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি তুলেছেন এবং পরে তার সমাধানও করেছেন। আপত্তিটি এই যে, লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। কেননা এমন কিছু প্রমার উল্লেখ করা যায় যেগুলির ক্ষেত্রে এই লক্ষনটি প্রয়োগ করা যায় না। যেমন— 'ঘটে ঘটত্ব আছে' এই অনুভবটি প্রমা হলেও বর্তমান প্রমার লক্ষণটি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। কারণস্বরূপ বলা যায় এই অনুভবে 'ঘটত্ব' হল বিশেষ্য এবং 'ঘট' হল প্রকার। এই অনুভবটিতে প্রমার লক্ষণ তখনই প্রয়োগ করা যাবে, যদি একথা বলা যায় যে— 'ঘট ঘটত্বে আছে'। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঘট ঘটত্বে থকে না, ঘটত্বই ঘটে থাকে। অর্থাৎ ঘটত্ব ঘটের অধিকরণ নয়, ঘটই হল ঘটত্বের অধিকরণ। অতএব তর্কসংগ্রহ প্রদত্ত প্রমার লক্ষণটি এখানে প্রযুক্ত হতে না পারায় লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে।

তর্কদীপিকাতে উক্ত দোষ উল্লেখ করার পর অন্নংভট্ট নিজেই এই দোষ পরিহারে প্রয়াসি হন। দীপিকাতে তিনি বলেন— লক্ষণের অন্তর্গত 'তদ্‌বৎ' পদটির 'বৎ' শব্দের অর্থ 'প্রকারের অধিকরন' নয়, 'বৎ'-এর অর্থ হল 'সম্বন্ধী'। একথা স্বীকার করলে প্রমার লক্ষণটির অর্থ এরূপ হয়, যেখানে যে সম্বন্ধ আছে সেখানে সেই সম্বন্ধের অনুভবই হল যথার্থ অনুভব বা প্রমা। এর দ্বারা ঘটত্বের সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ যেমন দেখানো যায়, তেমনি ঘটের সঙ্গে ঘটত্বের সম্বন্ধও দেখানো যায়। এর ফলে লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ পরিহার হয়।

প্রমার করণত্বই হল প্রমাণ। প্রমাণের উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত 'প্রমা' শব্দটির অর্থ না হয় বোঝা গেল, এখন আমাদের জানা দরকার লক্ষণের অন্তর্গত 'করণ' শব্দটির দ্বারা কি বোঝানো হয়। করণের স্বরূপ বা লক্ষণ বিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সার্বিক ভাবে ন্যায় দর্শনে করণের যে লক্ষণটি দেওয়া হয়, তা হল— 'অসাধারণং কারণং করণম্'। অর্থাৎ অসাধারণ কারণকেই বলা হয় করণ।

'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে অন্নংভট্ট কারণের লক্ষণে বলেছেন— 'কার্য্যনিয়তপূর্ববৃত্তি কারণম্'[১০]। অর্থাৎ যা নিয়মিতভাবে কোন কার্যের পূর্ববর্ত্তী হয়, তাকে কারণ বলে। উক্ত লক্ষণের অন্তর্গত প্রতিটি পদের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। লক্ষণের অন্তর্গত 'নিয়ত' পদটি যদি না থাকতো তাহলে লক্ষণটির অর্থ হত 'যা কার্যের পূর্ববর্তী তাই কারণ'। এক্ষেত্রে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটত। যেমন ধরা যাক, কোন কুম্ভকার ঘট তৈরির জন্য রাসভের (গাধা) পিঠে করে মৃত্তিকা বহন করে এনে ঘট তৈরি করল। এক্ষেত্রে রাসভ বা গাধা ঘটের পূর্ববর্তী হওয়ায় লক্ষণানুসারে গাধাকে ঘটের কারণ বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে গাধা তো ঘটের কারণই নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। এই অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য লক্ষণে 'নিয়ত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'নিয়ত' শব্দটি ব্যবহারের ফলে গাধাকে আর ঘটের কারণ বলতে হয় না, কেননা গাধা কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটের পূর্ববর্তী হলেও তা নিয়ত পূর্ববর্তী নয়।

আবার লক্ষণের অন্তর্গত 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 'পূর্ববৃত্তি' বলতে শুধুমাত্র 'পূর্বে থাকা' বোঝায় না , 'পূর্ববৃত্তি' শব্দের অর্থ হল 'অব্যবহিত পূর্বে থাকা'। কেবলমাত্র 'পূর্বে থাকা'কে যদি 'পূর্ববৃত্তি' হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে যে বিষয়টি কার্যের বহুকাল পূর্বে থাকে, তাকেও কার্যের কারণ রূপে গণ্য করতে হবে। এদিক থেকে ঘট তৈরির কারণরূপে কুম্ভকারের পিতা, প্র-পিতা প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করতে হবে, যেহেতু এরা ঘট সৃষ্টির পূর্বকালীন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঘটের কারণ রূপে এরা অস্বীকৃত। আর যদি 'অব্যবহিত পূর্বে থাকা' কে 'পূর্ববৃত্তি' হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে ঘটের কারণরূপে কুম্ভকার স্বীকৃত হবে, যেহেতু কুম্ভকার ঘট সৃষ্টির ঠিক অব্যবহিত পূর্বে অবস্থান করে। অতএব উক্ত ক্ষেত্রে 'পূর্ববৃত্তি' শব্দটি কেবল 'অব্যবহিত পূর্বে থাকা'— অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এখন লক্ষণের মধ্যে এই 'পূর্ববৃত্তি' পদটি যদি না থাকত তাহলে লক্ষণটির অর্থ হত— 'যা নিয়ত কার্যের সঙ্গে থাকে তাই কারণ'। এক্ষেত্রেও লক্ষণটি অতিব্যপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। কেননা পূর্ববৃত্তি ব্যতীত কারণের এই লক্ষণটি কার্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে যায়। আমরা জানি প্রত্যেক কার্যই নিয়তভাবে তার নিজের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। এখন 'কার্যনিয়তবৃত্তি কারণম' অর্থাৎ 'যা নিয়ত কার্যের সঙ্গে থাকে তাই কারণ— এটাই যদি কারণের লক্ষণ হয় তাহলে ঘটের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে ঘটকেই ঘটরূপ কার্যের কারণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যেহেতু ঘটরূপ কার্য নিয়ত ঘটের সঙ্গে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। স্পষ্টতই কারণের লক্ষণটি এখানে কার্যের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হওয়ায় অতিব্যপ্তি দোষ ঘটে থাকে। এই দোষ নিবারণের জন্য কারণের লক্ষণে 'পূর্ববৃত্তি' পদটি ব্যবহৃত হয়। 'পূর্ববৃত্তি' পদটি ব্যবহারের ফলে 'ঘটরূপ কার্য' কে আর ঘটের কারণ বলতে হয় না। কেননা 'ঘটরূপ কার্য' ঘট সৃষ্টির পূর্ববর্তী নয়, পরবর্তী। অর্থাৎ কার্যে নিয়তত্ব থাকলেও পূর্ববৃত্তিত্ব না থাকায় কারণের লক্ষণটি কার্যে অতিব্যাপ্তি হয় না। অতএব 'নিয়তত্ব' ও 'পূর্ববৃত্তিত্বকে' একত্রিত করে কারণের লক্ষণটি হয়— 'কার্য্যনিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্'।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত কারণের এই লক্ষণটিকে অন্নংভট্ট তাঁর 'দীপিকা'তে অসম্পূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে উক্ত লক্ষণে 'নিয়ত' ও 'পূর্ববৃত্তি'— এই দুটি বিশেষণ অতিরিক্ত আর একটি বিশেষণ যোগ না করলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। এর স্বপক্ষে অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাতে বলেন— 'ননু তন্তুরূপমপি পটং প্রতি কারণং স্যাৎ ইতি চেৎ, ন। অনন্যথাসিদ্ধত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ'। অর্থাৎ কারণের পূর্বোক্ত লক্ষণে 'অনন্যথাসিদ্ধ'— নামক একটি নতুন বিশেষণ যদি যুক্ত না করা হয় তাহলে 'তন্তুরূপ' পটের প্রতি কারণ বলে গ্রাহ্য হবে। তর্কসংগ্রহ প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে 'কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি'কে যদি কারণরূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে তন্তুকে যেমন পটের কারণ বলা হবে, তেমনি তন্তুরূপকেও পটের কারণ বলতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তন্তুরূপ পটরূপের কারণ হলেও পটের কারণ নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে কারণের লক্ষণটি তন্তুরূপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এই দোষ নিবারণের জন্য অন্নংভট্ট তাঁর 'দীপিকা'তে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটি যোগ করে কারণের লক্ষণটিকে এভাবে বলেছেন— 'অনন্যথাসিদ্ধত্বেসতি কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্'[১১] অর্থাৎ যে পদার্থ অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে নিয়ত কার্যের পূর্ববর্তী হয়, তাই কারণ।

এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে 'অনন্যথাসিদ্ধ' বলতে কি বোঝায় ? যা 'অন্যথাসিদ্ধ' নয় বা 'অন্যথাসিদ্ধে'র অভাবই হল 'অনন্যথাসিদ্ধি'। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে অন্যথাসিদ্ধ বলতে কি বোঝায় ?'অন্যথাসিদ্ধ' বিশেষণটির অন্তর্গত 'অন্যথা' বলতে বোঝায়— অন্যপ্রকার, আর 'সিদ্ধ' কথার অর্থ হল— প্রমাণিত। সুতরাং উক্ত ক্ষেত্রে অন্যথাসিদ্ধ বিশেষণটির অর্থএইভাবে বুঝতে হবে যে, যে পদার্থ কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও কার্য উৎপত্তি ছাড়া অন্য প্রকারে প্রমাণিত হয়, তাই হল অন্যথাসিদ্ধ।

বিষয়টিকে আরো সহজভাবে বললে বলতে হয়, যার অনুপস্থিতি কার্য উৎপত্তির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ যা কার্য উৎপত্তির ক্ষেত্রে অপরিহার্য নয় বা যার অভাব থাকলেও কার্যের উৎপত্তি হয়, তাই হল কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।

বিশ্বনাথ তাঁর ভাষা পরিচ্ছেদ গ্রন্থে পাঁচ প্রকার[১২] অন্যথাসিদ্ধের উল্লেখ করেছেন—

১. কোন কার্যের প্রতি কারণের পূর্ববর্ত্তীতা যে রূপের দ্বারা বা যে ধর্মের দ্বারা জানা যায় সেই রূপ বা ধর্মটি হল প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। যেমন— ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডত্ব হল অন্যথাসিদ্ধ। কেননা দণ্ড দণ্ডত্ব বিশিষ্ট হয়েই ঘটরূপ কার্যের পূর্ববর্তী হিসাবে জ্ঞাত হয়।

২. যার স্বতন্ত্রভাবে কার্যের সঙ্গে অন্বয়-ব্যতিরেক নেই, কিন্তু নিজের কারণকে গ্রহণ করেই যার অন্বয়-ব্যতিরেক গৃহীত হয়, তা হল অন্যথাসিদ্ধ। যেমন— ঘটকার্যের প্রতি দণ্ডরূপ হল অন্যথাসিদ্ধ। দণ্ডের রূপের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে ঘট কার্যের কোন অন্বয়-ব্যতিরেক (অর্থাৎ যেখানে যেখানে ঘট আছে, সেখানে সেখানে দণ্ডরূপ আছে এবং যেখানে যেখানে দণ্ডরূপ নেই, সেখানে সেখানে ঘট নেই) হয় না। কিন্তু দণ্ডরূপ সর্বদা দণ্ডে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই দণ্ডরূপ যুক্ত দণ্ডের সঙ্গে কার্য ঘটের অন্বয় ব্যতিরেক থাকায়, এক্ষেত্রে দণ্ডরূপ হল অন্যথাসিদ্ধ।

৩. অন্যের প্রতি অর্থাৎ উপস্থিত ঘটাদি কার্য ভিন্ন অন্যকার্যের প্রতি পূর্ববর্তী হয়েই যা ঘটাদি কার্যের প্রতিও পূর্ববর্তী হয়, তা ও একপ্রকার অন্যথাসিদ্ধ। যেমন— ঘটকার্যের প্রতি আকাশ হল অন্যথাসিদ্ধ। কেননা ঘটাদি কার্য ভিন্ন শব্দরূপ কার্যের প্রতি আকাশ পূর্ববর্তী হওয়ার পরেই তা ঘটরূপ কার্যের পূর্ববর্তী হয়।

৪. যা কার্যের জনকের অর্থাৎ কারণের পূর্ববর্তী হয়েই কার্যের প্রতিও পূর্ববর্তী হয়, তা ঐ কার্যের অন্যথাসিদ্ধ। যেমন— ঘট কার্যের প্রতি কুম্ভকারের পিতা হল অন্যথাসিদ্ধ। ঘটরূপ কার্যের জনক বা কারণ হল কুম্ভকার। কুম্ভকারের পিতা এই ঘটরূপ কার্যেরও পূর্ববর্তী হয়। তাই এক্ষেত্রে কুম্ভকারের পিতা হল ঘটরূপ কার্যের অন্যথাসিদ্ধ।

৫. অবশ্যস্বীকার্য নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ দ্বারাই যদি কার্য সম্ভব হয়, তাহলে তা ভিন্ন আর সমস্ত কিছুই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন— ঘটরূপ কার্যের প্রতি রাসভ বা গর্দভ হল এই পঞ্চম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ, কেননা রাসভ বা গর্দভের অব্যবহিত পরেই ঘটের উৎপত্তি হয় না। রাসভ বা গর্দভ ঘটরূপ কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী নয় অর্থাৎ রাসভ বা গর্দভ হল ঘটরূপ কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী ভিন্ন পদার্থ। তাই রাসভ বা গর্দভ হল ঘটরূপ কার্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ।

বিশ্বনাথ তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের স্বরূপ নির্দেশ করলেও পরবর্তীকালে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে একটি বিভাগের দ্বারাই এই পাঁচপ্রকার বিভাগকে সূচিত করা যায়। তাঁর মতে পঞ্চম প্রকার অন্যথাসিদ্ধের মধ্যেই অপর চারটি অন্যথাসিদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আবার তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট অন্যথাসিদ্ধের এই পাঁচ প্রকার বিভাগ অস্বীকার করেন। তিনি গঙ্গেশের মত অনুসরণ করে তিন প্রকার অন্যথাসিদ্ধের উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে বিশ্বনাথ উল্লেখিত পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অন্নংভট্টের মতে বিশ্বনাথ উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার অন্যথাসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম প্রকার অন্যথাসিদ্ধ তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ঘটরূপ কার্যের ক্ষেত্রে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম 'দণ্ডত্ব' এবং কারণের গুণ যে 'দণ্ডরূপ' তা হল প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। 'আকাশ' ও 'কুম্ভকার পিতা' হল দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ। আর 'রাসভ' বা 'গর্দভ' হল তৃতীয় প্রকার অন্যথাসিদ্ধ।

অন্নংভট্টের মতে উপরোক্ত সকল প্রকার অন্যথাসিদ্ধই কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও কোন প্রকার অন্যথাসিদ্ধই কার্যের কারণ নয়। যা এই সকল প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অভাব হয়ে অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ রূপে কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হয়, তাই হল

কারণ। কারণের এইরূপ লক্ষণ স্বীকার করলে লক্ষণটি আর পট উৎপত্তির কারণ হিসাবে তন্তুরূপে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ এক্ষেত্রে তন্তুরূপ পটের নিয়ত পূর্ববর্তী হলেও পটের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ না হওয়ায় তন্তুরূপকে আর পটের কারণ বলা যায় না। সুতরাং কারণের পূর্ণাঙ্গ ও পরিমার্জিত লক্ষণটিকে এইভাবে বলা যায় — অনন্যথাসিদ্ধ হয়ে যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী হয়, তাই হল কারণ।

ন্যায় মতে কারণ তিন প্রকার — ১. সমবায়ি কারণ, ২. অসমবায়ী কারণ ও ৩. নিমিত্ত কারণ। এই তিন প্রকার কারণের মধ্যে যে কারণটি অসাধারণ হয় অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার কারণ থেকে যা উৎকৃষ্ট হয়, তা-ই হল করণ। কোন কার্যের দু-প্রকার কারণ থাকতে পারে — সাধারণ কারণ ও আসাধারণ কারণ। যে সকল কারণগুলি যেকোন প্রকার কার্যের উৎপত্তিতে বা সকল প্রকার কার্যের উৎপত্তিতে সর্বদা সমানভাবে উপস্থিত থাকে, সেই কারণগুলি হল সাধারণ কারণ। ন্যায় মতে আট প্রকার সাধারণ কারণ স্বীকার করা হয়— ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, দিক, কাল, অদৃষ্ট ও কার্যের প্রাগভাব। যেকোন কার্যের ক্ষেত্রেই এই কারণগুলি অবশ্যই স্বীকার্য, তাই এগুলি সাধারণ কারণ। এই আট প্রকার সাধারণ কারণ ভিন্ন যে কারণ, তা-ই হল অসাধারণ কারণ। 'অসাধারণ' শব্দটির দ্বারা নৈয়ায়িকরা 'করণ' ও 'কারণের' মধ্যে বিভেদ করেছেন। তাঁদের মতে করণমাত্রই তা কারণের অন্তর্ভুক্ত হলেও যেকোন কারণ করণ নয়। করণ হল কোন কার্যের প্রতি বিশেষ কারণ বা অসাধারণ কারণ। তাই করণের লক্ষণে বলা হয়েছে — 'অসাধারণং কারণং করণম্' অর্থাৎ অসাধারণ কারণই হল করণ।

করণের উক্ত লক্ষণটিতে একপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যাটি এরূপ যে, লক্ষণের অন্তর্গত 'অসাধারণ' শব্দটির অর্থ যদি 'সাধারণ ভিন্ন' অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে কোন একটি কার্যের ক্ষেত্রে তার করণ কোনটি হবে, তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে। ধরাযাক, একজন তন্তুবায় তন্তুর দ্বারা একটি পট উৎপন্ন করল। এক্ষেত্রে কার্য হল পট। এই পটরূপ কার্যের সমবায়ি কারণ হল তন্তু। অসমবায়ি কারণ হল তন্তু সংযোগ। আর নিমিত্ত কারণ হল তন্তুবায়, তুরি, বেমা ইত্যাদি। উক্ত ক্ষেত্রে তিনটি কারণের কোনটিই ন্যায় স্বীকৃত আটপ্রকার সাধারণ কারণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এখন 'অসাধারণ' শব্দটিকে যদি 'সাধারণ ভিন্ন' এই অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে উপরে উল্লেখিত সকল প্রকার কারণকেই অসাধারণ কারণ বলতে হবে। কেননা এই কারণগুলির প্রত্যেকটিই 'সাধারণকারণ ভিন্ন' কারণ। এরফলে পটরূপ কার্যের করণরূপে যেমন সমবায়ি কারণ তন্তুকে স্বীকার করতে হয়, তেমনি অসমবায়ি কারণ তন্তুসংযোগ এবং নিমিত্ত কারণ তুরি, বেমাদিকেও পটরূপ কার্যের কারণ রূপে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু একটি কার্যের ক্ষেত্রে একাধিক কারণ স্বীকার করা গেলেও অসাধারণ কারণ হিসাবে কেবলমাত্র একটি কারণকেই স্বীকার করতে হবে এবং সেটিই হবে ঐ কার্যের করণ। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, একাধিক কারণের মধ্যে কোন একটি কারণকে আমরা কিসের ভিত্তিতে অসাধারণ কারণ বলে চিহ্নিত করতে পারি ? অন্নংভট্ট এ বিষয়ে কোন সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। তবে অন্যান্য প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকগণ 'অসাধারণং কারণং করণম্' — করণের এই লক্ষণের অন্তর্গত 'অসাধারণ' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে করণের যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছেন।

নব্য নৈয়ায়িকরা 'অসাধারণ' শব্দটিকে 'ব্যাপারবদ্' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কাজেই তাদের মতে করণের সম্পূর্ণ লক্ষণটি হল 'ব্যাপারবদ্ অসাধারণং কারণং করণম্'[১৩]। অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট অসাধারণ কারণ হল করণ। আরো ব্যাখ্যা করে বলা যায়, একটি কার্যের একাধিক অসাধারণ কারণ থাকলেও যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে কার্য উৎপন্ন করে, তাই হল করণ। লক্ষণটিকে বুঝতে হলে 'ব্যাপার' শব্দটির অর্থ বোঝা প্রয়োজন ।

ব্যাপারের লক্ষণে বলা হয়েছে — 'দ্রব্যান্যত্বে সতি তজ্জন্যতে সতি তজ্জন্যজনকত্বম্'[১৪]। লক্ষণের অন্তর্গত 'তৎ' শব্দের দ্বারা 'কারণকে' বোঝায়, 'জন্য' শব্দের দ্বারা 'কার্য'কে বোঝায়, আর 'জনক' শব্দের অর্থ হল 'কারণ'। সুতরাং এই লক্ষণটির অর্থ এইভাবে বুঝতে হবে যে, দ্রব্য ভিন্ন যে পদার্থ কোন কারণের কার্য হয়ে ঐ কারণের কার্যকে উৎপন্ন করে, তাই হল ব্যাপার। যেমন — কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন-এর ক্ষেত্রে 'কুঠার সংযোগ' হল ব্যাপার। আমরা জানি সংযোগ কোন দ্রব্য পদার্থ নয়, তা গুণ পদার্থ। আবার 'কুঠার সংযোগ' হল কুঠাররূপ কারণের কার্য। আর ছেদন ক্রিয়া হল কার্য। সুতরাং এক্ষেত্রে বলতে হয়, কুঠার সংযোগরূপ দ্রব্য ভিন্ন পদার্থ কুঠারের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে অর্থাৎ কুঠার রূপ কারণের কার্য হয়ে ঐ কারণের দ্বারা উৎপন্ন ছেদনক্রিয়ারূপ কার্যের জনক হওয়ায় এখানে কুঠার সংযোগ হল ব্যাপার। অর্থাৎ কুঠার রূপ কারণটি কুঠার সংযোগরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট হওয়ায় উক্ত ক্ষেত্রে কুঠারই হল ছেদন রূপ ক্রিয়ার করণ। অতএব নব্য মতানুসারে যে অসাধারণ কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হয়ে কোন কার্যের জনক হয়, তাই করণ।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ নব্যদের এই মত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যা ব্যাপারবিশিষ্ট তা করণ নয়, আসলে ব্যাপারটাই হল করণ। নব্যগণ করণের লক্ষণটিকে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন — 'ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্ন কারণং করণম্'[১৫]। এখানে 'ফল' কথার অর্থ হল 'কার্য', 'অযোগ' শব্দের অর্থ 'যোগহীন' এবং 'ব্যবচ্ছিন্ন' বলতে বোঝায় 'না-হওয়া'। কাজেই লক্ষণটির অর্থ এইভাবে বলা যায় যে, যে কারণ কখনোই ফলের সঙ্গে বা কার্যের সঙ্গে যোগহীন হয় না, তাই করণ। আবার অন্য ভাবে বলা যায়, ফলের সঙ্গে অযোগরহিত বা যোগযুক্ত যে কারণ তাই হল করণ। আসলে প্রাচীনগণ এখানে একথাই বোঝাতে চান যে, কোন কার্যের একাধিক অসাধারণ কারণ উপস্থিত থাকলেও যে অসাধারণ কারণটির অভাবে কার্য উৎপন্ন হয় না বা যে কারণটি থাকলে কার্যটি অবশ্যই উৎপন্ন হয়, তাই হল সেই কার্যের করণ। যেমন— কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদনের ক্ষেত্রে একাধিক অসাধারণ কারণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি কুঠার-সংযোগ এর অভাব হয় তাহলে ছেদন রূপ কার্যটি কোনভাবেই ঘটতে পারে না। আবার একাধিক অসাধারণ কারণের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে যদি কুঠার সংযোগ রূপ কারণের অভাব না হয় অর্থাৎ কুঠার-সংযোগরূপ কারণটি থাকে, তাহলে ছেদন রূপ কার্যটি অনিবার্যভাবেই ঘটবে। সুতরাং এক্ষেত্রে কুঠার-সংযোগ রূপ ব্যাপারটিই হল ছেদন রূপ কার্যের করণ।

প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক স্বীকৃত করণের উক্ত লক্ষণগুলি তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেননি। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে নব্য মত অনুসরণ করে 'ব্যাপারবদ্' কারণকে করণ বলেছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন মত অনুসরণ করে 'ব্যাপার'কেই করণ বলেছেন। যেমন — প্রত্যক্ষ প্রমার ক্ষেত্রে তিনি ব্যাপারবদ্ রূপ ইন্দ্রিয়কে করণ বলেছেন, আবার অনুমিতি প্রমার ক্ষেত্রে ব্যাপাররূপ পরামর্শকেই করণ রূপে স্বীকার করেছেন। তবে করণের স্বীকার্য্যতা বিষয়ে তাঁর মতের বিভিন্নতা থাকলেও তিনি সব ক্ষেত্রেই অসাধারণ কারণকেই করণ বলেছেন।

প্রমাণের সামান্য লক্ষণ প্রসঙ্গে লক্ষণোক্ত করণ সংক্রান্ত ধারণার উপরোক্ত অর্থবোধের পর প্রমার করণ-ই যে প্রমাণ, তা স্পষ্ট হয়। তদনুসারে ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমা স্বীকৃত হয়েছে, তারমধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় করণ হওয়ায় তা যেমন প্রমাণ পদবাচ্য, তেমনি অনুমিতি রূপ প্রমার ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতি রূপ প্রমার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য জ্ঞান এবং শাব্দবোধের ক্ষেত্রে পদজ্ঞান করণ হওয়ায় তা পৃথক পৃথকভাবে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয়। সুতরাং 'প্রমার করণত্বই প্রমাণ'— প্রমাণের এরূপ সামান্য লক্ষণ সর্বজনগ্রাহ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত, একথা বলা যেতে পারে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১। তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, *ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)*, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭৩, ২০১৪, পৃ. ২৯।

২। তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, *ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)*, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭৩, ১৯৮৯, পৃ. ২৫।

৩। তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, *ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)*, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭৩, ২০১৪, পৃ. ১৮।

৪। তদেব, পৃ. ১।

৫। তদেব, পৃ. ২৯।

৬। তদেব, পৃ. ৮৩।

৭। তদেব, পৃ. ৮৪।

৮। শাস্ত্রী, পঞ্চানন, *বেদান্ত পরিভাষা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা - ০৬, ১৯৭১, পৃ. ৩।

৯। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, *সটীকঃ তর্কসংগ্রহ অধ্যাপনাসহিতঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা – ০৬, ১৪২৩, পৃ. ২৮২।

১০। পোদ্দার, কানাইলাল, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা – ০৯,২০১৪-১৫, পৃ. ৯৩।

১১। তদেব, পৃ. ৯৩।

১২। ঘোষ, ড. শ্রী দীপক, *ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা*, সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলকাতা - ০৬, ২০০৩, পৃ. ১৭০।

১৩। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, *সটীকঃ তর্কসংগ্রহ অধ্যাপনাসহিতঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা – ০৬, ১৪২৩, পৃ. ২৯১।

১৪। তদেব, পৃ. ২৯১।

১৫। পোদ্দার, কানাইলাল, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা – ০৯, ২০১৪-১৫, পৃ. ১০৩।

সহায়ক গ্রন্থ

১। কর, শ্রী গঙ্গাধর, *শ্রীকেশবমিশ্রবির চিতা তর্কভাষা (১ম খণ্ড)*, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, কলকাতা –৩২, ২০১৩।

২। গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, *সটীকঃ তর্কসংগ্রহ অধ্যাপনাসহিতঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা – ০৬, ১৪২৩।

৩। ঘোষ, ড. শ্রী দীপক, *ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা*, সংস্কৃত বুক ভাণ্ডার, কলকাতা – ০৬, ২০০৩।

৪। ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র, *ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্ররচিত বেদান্ত পরিভাষা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪।

৫। চৌধুরী, ড. অনামিকা রায়, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তবলীসহিতঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা–০৬, ২০১১।

৬। তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, *ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)*, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭৩, ২০১৪।

৭। তর্কবাগীশ, ফনিভূষণ, *ন্যায়দর্শন (২য় খণ্ড)*, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা - ৭৩, ২০১৫।

৮। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায় পরিচয়*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা – ৭৩, ২০০৬।

৯। পোদ্দার, কানাইলাল, *তর্কসংগ্রহ দীপিকাসহ*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা – ০৯,২০১৪-১৫।

১০। ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও ভট্টাচার্য, শ্রী দীনেশ চন্দ্র, *ভারতীয় দর্শনকোষ (১ম খণ্ড)*, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ, কলকাতা, ১৯৭৮।

১১। ভট্ট, নারায়ণ, *মানমেয়োদয়*, অনুবাদ শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠি নবতীর্থ, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৮৯।

১২। মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা, *তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,কলকাতা–৭৩, ২০১৫।

১৩। শাস্ত্রী, আশুতোষ, *বেদান্ত দর্শনে অদ্বৈতবাদ (২য় খণ্ড)*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯।

১৪। শাস্ত্রী, পঞ্চানন, *বেদান্ত পরিভাষা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা - ০৬, ১৯৭১।

১৫। সেনগুপ্তা, আচার্য্য জ্যোতি, *ভারতীয় দর্শন সমগ্র*, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা – ০৬, ২০১৭।

১৬। সেন, দেবব্রত, *ভারতীয় দর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা – ৭৩, ২০১৪।